কুয়াশার বারান্দায় যারা দাঁড়িয়েছিল

শুভদীপ মৈত্র

সারাদিন কুয়াশা সরেনি। সেপ্টেম্বরের শুরুতে শীত না থাকলেও বৃষ্টি আছে, আর যখন বৃষ্টি নামে তখন ঠান্ডা লাগে গায়ে, ভ্রমণার্থীরা কেঁপে ওঠে, আনন্দও পায় হয়তো।

এখন যেমন বৃষ্টিটা আবার নেমেছে, মনোজ ভিতরে বসেই বুঝতে পারে, পাহাড়ি ছেলে, তার বোঝাটা স্বাভাবিক। সে বসে আছে একটা ছোটো কাঠের তৈরি দোকানে, সোনা-জ ট্যুর অ্যান্ড ট্রেকিং, ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডকে বাঁয়ে রেখে দশ পনের মিনিট হাঁটা দুরত্বে, ম্যাল থেকে সামান্য নিচে। এখানে দুপুর সন্ধ্যে খাবার থেকে আশপাশে ঘোরার জন্য ভাড়ার গাড়ি সবই মেলে।

দোকানটা খুবই ছোট, একটাই ঘর যার সামনের অংশটায় টেবল পাতা গোটা চারেক, অপ্রশস্ত বেঞ্চ সেখানে বসে থুকপা থেকে ভাত সবই খাওয়া যায়। সস্তা এবং মুখরোচক রান্না বলে ট্যুরিস্টরাও খায়, এ ছাড়া গাড়ির চালক বা আশপাশের দোকান চালাবে যারা তারা তো আসেই। পার্টিশন করা ঘরটার পিছনের অংশে রান্নার স্টোভ, সরঞ্জাম, এ ছাড়া বুকিং-এর খাতাপত্র কি না কি রয়েছে, মনোজের জানা নেই। জানতে চায়ও না সে।

আই হ্যাভ বিন বাইকিং ইন দিস পার্ট অফ মাউন্টেইন সিনস মাই টিন, দরজার বাম দিকের টেবল-এ বসা লোকটার গলা কানে এল। বছর পঞ্চাশের লোকটির মুখোমুখি বসা মেয়েটাকে বলছে, অলস গলা শুনে মনোজ বুঝল বেশ জমিয়ে বসেছে দুপুরবেলা, একটা বিয়ারের বোতল আর গ্লাস সামনে, কয়েকটা মোমো রয়েছে প্লেটে। মনোজ হতাশ, এরা কখন উঠবে, তার দরকার রয়েছে, অথচ এখন উঠবে বলে মনে হচ্ছে না।

একটু আগে সে এসে বসেছে, তখনও এরা আসেনি, কিন্তু অন্য লোক ছিল, প্রেমা তখন ব্যস্ত হয়ে ফর্দ বানাচ্ছিল, সঙ্গে হিসেব মেটাচ্ছিল ট্যুরিস্ট-এর সঙ্গে। প্রেমা এই ব্যবসা প্রায় একা হাতে চালায়। তার স্বামী কী একটা কাজ করে কালিম্পং-এ, মনোজ জানে না, জানার চেষ্টাও করেনি।

অলিভ গ্রিন জ্যাকেট পরা লোকটা বেশ বড়সড় দোহারা চেহারা, বলিষ্ঠ কাঁধ, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, একটু ভুঁড়ির লক্ষণ, যা বয়সোচিত বা বিয়ারোচিতও বলা যায়। মাথার চুল ছোট হলেও বোঝা যায় টাক পড়ছে, কপাল প্রশস্ত হয়েছে এবং মাঝখানটার চুল বেশ পাতলা। চেহারার সঙ্গে বড় এবং ঘন গোঁফটা বেশ মানানসই, একটা ওজন তৈরি করেছে।

বিয়ারে চুপুক দিয়ে সে মেয়েটাকে বলল আরে এনজয় দ্য ড্রিঙ্ক কলকাতায় এমন আরামে খেতে পারবে না, মেয়েটাকে সামনে গ্লাসটার তরল অনেকক্ষণ ধরেই একই পরিমাণে রয়েছে। মেয়েটা সলজ্ হাসল, বলল তাড়াতাড়ি খেতে পারি না। তারপর ছোটো একটা চুমুক দিয়ে ন্যাপকিনে মুখ মুছল, সাইড পার্টিং কাঁধ পর্যন্ত চুল খোলা ডান দিকের চোখের উপর কিছুটা পড়েছে। সাতাশ আঠাশ বছর বয়সের মেয়েটা যদিও দেখে বাইশ চব্বিশও মনে হতে পারে। গোলাপি রঙের পুলোভার-এ তাকে ভালই লাগছে, গলায় ডিপ দেওয়া কলার পর্যন্ত যেটা এখন নামানো। এই থমথমে আবহাওয়ায় এই রঙের উচ্ছ্বাসটা ভাল লাগছিল লোকটার।

লোকটা হাসল, সুইট-হার্ট দিস ইজ দ্য এজ টু ড্রিঙ্ক উইদাউট কেয়ার। ডায়েটের দরকার কী তোমার?

তার চোখ মেয়েটার শরীরে একবার ঘুরল, ছোটখাটো কিন্তু সুডৌল চেহারা, যেন তেজি ঘোড়ার ছিবটায় মাথায় এল কারণ ম্যাল-এ ওই জন্তুটার পিঠে তাকে সে দেখেছে।

আহ্, মেয়েটা অপ্রস্তুত গলায় বলে উঠল। আধো আধো গলা, অপ্রস্তুত হলেও অনুৎসাহী নয়, লোকটা বিয়ারে বড় চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। বাইরে বৃষ্টি জোরে নেমেছে। রাস্তার উপর, কার্নিশে, কাঠে বৃষ্টি পড়ার আওয়াজ, অন্ধকার বেশ ঘনিয়েছে। টিমে টিমে আলো জ্বলছিল দোকনের ভিতর, আরও যেন আশপাশের অন্ধকারটা ঘিরে ধরেছে।

চুপচাপ ভিতরে বসে প্রেমা রান্নার কাজ করে চলেছে, পিছন থেকে অবয়বটা শুধু দেখতে পাচ্ছিল মনোজ কাঠের পার্টিশনের আড়ালে, যেটুকু কাউন্টারের মতো করে কাটা। মনোজ নিজের ভাবনায় ডুবে, দুদিন সে কাজে যায়নি, একটা কিউরিও দোকানের রিসেপশনে সে চাকরি করে। চার পাঁচ বছরে সে প্রথম বিনা কারণে কামাই করল, গত দুদিন ধরেই সে এখানে আসছে এই দোকানে প্রেমার কাছে। যদিও কারণটা মুখ ফুটে বলার সুযোগ হয়নি, বা সে পারে। আর আজ যেভাবে এরা বসে আছে তাতে তো এখনি উঠবে বলে মনেও হচ্ছে না মনোজ-এর, মাদার মেরি ভরসা, মনে মনে সে বলে উঠল।

আশেপাশে কারা আছে সে নিয়ে লোকটার কোন মাথাব্যথা নেই, সে নিজের মনে বলে চলেছে, আহ কলকাতায় বড় বেশি জড়িয়ে পড়েছি। চাকরি, ফ্যামিলি, দেখোই তো কতটা দায়িত্ব নিতে হয় আজকাল আমায়। মজা করার সময় মেলেই না। আই নিড টাইম অফ মাই ওন।

মেয়েটা চুপ।

আমাকে এখানে অন্য রকম লাগছিল কি? আবার সে প্রশ্ন করল।

-এতটা কাছ থেকে তো দেখিনি আগে।

তো সেক্ষেত্রে কী মনে হচ্ছে?

-অন্যরকম।

-উ্য গার্লস, নেভার বি ওপেন হাহা। খুলেই বল না, এটা তো আর অফিসে তোমার অ্যাসেসমেন্ট -এর প্রশ্ন করছি না।

মেয়েটার হঠাৎ মনে হল, প্রশ্নটা একদম সেরকমই। তার মুখে একটা রাগের রেশ খেলে গেল, যদিও চকিতে, আর সেটা এড়ানোর জন্য গলাটা মখমলি করে বলল, এখনও পুরোটা বুঝিনি, যতটা দেখেছি ভাল লেগেছে।

বেটার দ্যান উ্যর বয়ফ্রেন্ড, কি বল?

মেয়েটার ভুরু কুঁচকাল, এ বিষয়ে কোনো কথা সে শুনতে বা বলতে চায় না। প্লিজ... সে থামাতে চাইল লোকটাকে।

লোকটা একটু চুপ, বিয়ারের গ্লাস শেষ করে বলল, কাম অন তুমিই কলকাতায় বলেছিলে ইউ আর বোরড অফ হিম। অস্বস্তি হচ্ছিল মেয়েটার, চুলে হাত বুলিয়ে এক চোখের উপর দিয়ে আঙুলগুলো কপালে রাখল নিজের, ঢাকতে চাইছে চোখগুলো, আড়াল চায় লোকটার থেকে। এই অস্বস্তি পুরুষটি উপভোগ করছে, ইচ্ছে করেই প্রসঙ্গটা বলেছে, মেয়েটাকে এ অবস্থায় দারুণ দেখতে লাগছে। টানটান, মুখে একটু রাগের অভিব্যক্তি তাতে আরও উত্তেজক।

প্রেমা কাজ করতে করতেও ভাবছিল, মনোজ বাইরে বসে রয়েছে, এই নিয়ে তিন দিন হল। কী করা যায় কি চায়, ওর মায়া হচ্ছিল মনোজের জন্য। এত বছর পর হঠাৎ সে আবার উদয় হয়েছে, প্রেমা হিসেব করে দেখল প্রায় বছর দশেক কেটে গেছে। তখন কত কম বয়স ছিল তার, হেমার। হেমা যদিও ওর থেকে ছোট ছিল কিছুটা।

এখন অবশ্য তার কিছু এসে য়ায় না। অনেক কষ্ট করে ব্যবসা চালাচ্ছে, মাঝে মধ্যেই ঝামালে, হরতাল, টুরিস্ট আসাটা পিক সিজেন বন্ধ হয়ে গিয়ে বিপদ। দাঁতে দাঁত চিপে চালাতে হয়। সে নিজের জন্য ভাবে না, কিন্তু মেয়েটা বড় হচ্ছে স্কুলে পড়ে। এখনও জানে না এ বছর কি হবে সামনেই তো পুজো, দেওয়ালির ভরা সময়, মহাকাল-এর হাতে তার সমস্ত সঁপে দিয়ে বসে আছে সে।

মনোজকে প্রেমা ভিতরের একটা আয়না দিয়ে দেখছিল, ওটা বাইরে থেকে চোখে পড়ে না। ছেলেটা বদলায়নি। সেই কুড়ি একুশ বছরের মনোজ জোসেফ, গিটার কাঁধে সোৎসাহে ঘুরে বেড়াচ্ছে, রক ব্যান্ড ছিল একটা, কলেজটলেজ না করে শুধু স্ট্রামিং আর স্ট্রামিং, রক দ্য ওয়ার্ল্ড। সে ছটফটানি যায়নি মনে হচ্ছে, এখনো কেমন এক জায়গায় বসে উশখুশ করে চলেছে, কখনো সামনে ঝুঁকে বসছে কখনো হাত দুটোকে মটকাচ্ছে। চেহারা খুব বদলায়নি, শুধু একটু রোগা হয়েছে, গাল আর চোখ দুটো বসা, যদিও তা না ঘুমনোর কারণে হতে পারে। তবে আগের মতো কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল নেই, ঘাড়ের কাছ পর্যন্ত ছাঁটা, একটু অবিন্যস্তও।

মনোজ আসায় সে নিজের দিকে তাকানোর ফুরসৎ পেল অনেকদিন পর, প্রেমা আবিষ্কার করেছে সে এখন পৃথুলা, বয়সের তুলনায় একটু বেশিই লাগে অথচ মনোজেরই বয়সী সে। এক সময় মনোজ ওকে ভালবাসত যদিও পরে হেমার প্রতি আকৃষ্ট হয় আর তাকে ছেড়ে...যদিও এসব কথা আর সে মাথায়ও রাখতে চায় না। বরং মনোজকে দেখে তার বাচ্চা মনে হচ্ছে, এখনও কেমন সরল।

-এক সময় মাঝে মধ্যে কিন্তু আকাশ একদম পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির পর মেঘ কেটে দারুণ ঝলমল করে। ইটস আওয়ার ব্যাড ল্যাক, আমরা এখনো তা দেখিনি, এবার কুয়াশাও কাটছে না শীতকাল।

ব্যাড লাক শব্দটা শুনে মুখটা কালে হয়ে গেল মেয়েটার। সে এর আগে দার্জিলিং-এ এসেছে সেই ছোটবেলায়। তার স্মৃতি অন্যরকম। আইসক্রিম, চিরিয়াখানা এক দল আত্মীয় স্বজন এই সবের তালগোল পাকানো স্মৃতি। বিশেষ করে ম্যালটা তখন মনে হত কী বিশাল। এবার এসে মনে হল ছোট হয়ে গেছে। যেন এইটুকু জায়গা একটা।

আমার ভালই লাগছে, সে বলল তবু। কথাটা মিথ্যেও নয়। কুয়াশার মধ্যে ঘুরতে তার খারাপ লাগছিল না, এমনিও তেমন কোনো লোকজন নেই ভ্রমণার্থী খুবই কম, তার উপর কুয়াশার এই ঘেরাটোপ যেন তাকে লুকিয়ে রেখেছে, নিভৃতে, গোপনে। সে খুব একটা কোথাও যায়নি, যদি তাকে বেশ কবার বলেছে তার সঙ্গী মহাকাল মন্দিরে গেছে শুধু, আর একবার সি আর দাস রোড ধরে ভুটিয়া বস্তি মনাস্টেরির দিকে কিছু দূরে গিয়ে বৃষ্টি জোরে নামায় ফিরে এসেছে। তার ভাল লাগছিল ম্যালের বেঞ্চ-এ বসে থাকতে অনেকক্ষণ ধরে। আর দূরে কুয়াশায় ঘেরা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে।

মেয়েটা এখানে এসে একটু মিইয়ে গেছে, লজ্জা পাচ্ছে কি না কে জানে, লোকটা ভাবছিল। কলকাতায় যথেষ্ট প্রাণোচ্ছল, অফিস থেকে বেরিয়ে তার সঙ্গে রেস্তোরাঁয়, বারে, সিনেমায় গেছে, নিজে নিজেই বলেছে যাবে। এদিক ওদিক এক দুদিন কাটিয়ে এসেছে। যদিও সে বিবাহিত, আর এ নিয়ে মেয়েটার কোনো সমস্যা নেই, আই এনজয়

ইয়োর কম্পানি বহুবার বলেছে। এবারের আসাটার মধ্যেও যে গোপনীয়তা এবং তার পরিকল্পনায়ও সে সক্রিয়ভাবে ছিল। তবু এসে থেকে একটু আড়ষ্ট।

এত বৃষ্টি হচ্ছে আজ, কাল সকালে আকাশ একদম ক্লিয়ার পেতে পারি আমরা, লোকটা বলল মেয়েটার দিকে তাকিয়ে। তার প্রথম দুতিন দিন দিব্য কাটছিল সময়, সকালে ব্রেকফাস্ট করে অল্প ঘোরাঘুরি, সন্ধ্যায় পাবে গিয়ে গান শোনা। সারা দুপুর মেয়েটার সঙ্গে ঘরে বসে বিয়ার আর শরীরের উত্তাপ বিনিময়। ফ্রি ফলিং একেবারে, হালকা লাগছিল অনেকদিন পর। গত দিন থেকে মেয়েটা চুপচাপ হয়ে গেছে, একটু ঠান্ডা, কুয়াশা যেন ঘিরে ফেলেছে তাকে।

সকালে যাব তাহলে ম্যাল-এ, মেয়েটা উত্তর দিল। আগ্রহ দেখাল একটু বেশিই, যা নিজের কানেই বাজল তার, ঠোঁট মুচড়ল সে।

-হ্যাঁ যদি উঠতে পারো তাড়াতাড়ি, আই উইল নট লেট ইউ স্লিপ ইজিলি টুনাইট।

কথাটা খুব সহজ ঠাট্টার মত শোনাল না, লোকটা যা চেয়েছিল। কর্কশ বেআবরু। দুজনেই বুঝল। দু-জনেই চুপ, ঢুকে গেল যে যার নিজের খেলায়।

মনোজ দেখল প্রেমা বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, বেলা প্রায় দুটো বেজে গেছে, এবার সে অর্ডার নেবে তিনটে নাগাদ সে দোকান বন্ধ করে বাড়ি যায়, নিচে বাস স্টান্ডের কাছে তার বাড়ি হিল কার্ট রোডে। আবার সে পাঁচটা নাগাদ ফিরে আসে।

লোকটি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কী খাবে, তারপর প্রেমার দিকে তাকিয়ে বলল দু-প্লেট থুকপা, আর একটা বিয়ার। প্রেমা রান্না ঘরের দিকে গেল, তারপর একটা প্লেটে কয়েকটা মোমো সাজিয়ে নিঃশব্দে রেখে গেল মনোজের সামনে। প্রেমা পিছন ফিরে যাচ্ছিল যখন তার দিকে চোখ পড়ল লোকটির, বেশ স্বাস্থ্যবতী যুবতী, চুলের যথেষ্ট বাহার আছে, পোশাক সাধারণ হলেও বোঝা যায় তা গুছিয়ে পরা। আগে তার খেয়াল হয়নি, চোখ দুটো একটুক্ষণ আটকে রইল মহিলাটির ঘাড় পিঠ, কোমরে। তারপর চোখ সরিয়ে সে আরেকটা সিগারেট ধরাল।

বাইরে থেকে আরেকজন হাজির হয়েছে, স্থানীয় লোক, প্রেমা তাকে বসতে বলল না শুধু কয়েকটা হুকুম করে ভাগিয়ে দিল লোকটা বেজার মুখে চলে গেল। লোকটার যাতায়াতের ফলে দরজার মুখের ভারী পর্দাটা সরে এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া ঢুকে এল। মেয়েটা তার সোয়েটারের গলার জিপটা আঁটো করল একটু। বৃষ্টি কমেছে বাইরে, হালকা কুয়াশার আচ্ছাদনের ভিতর দিয়ে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে ধুসর, ধুসর রঙটাও যে কতটা উজ্জ্বল হতে পারে সেটা দার্জিলিঙে বোঝা যায়।

এমনভাবে খাবার দিয়ে যাওয়ার মনোজ অসহায়। সে বুঝতে পেরেছে বাকিরা সহজে উঠবে না, সে চলে যেত আজকেও কিন্তু খাবার দেওয়ায় চট করে উঠতে পারছে না। আর কিছু বলার ইচ্ছেও তার চলে যাচ্ছে, কী বা বলবে?

তামাংকে গত কদিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন সবাই জানে সে নেই, মেরে ফেলা হয়েছে, রাজনীতির চক্করে পড়েছিল। এতদিন সে কোনো খবর রাখেনি তামাং-এর, অথচ তারই বন্ধু, একসঙ্গে কত গান গেয়েছে, আড্ডা, সিগারেট ফোঁকা। শুনেছিল সে জড়িয়ে পড়েছে, রাজনীতি, জাতিসত্তা, আন্দোলন। এসবের সঙ্গে হঠাৎ জড়িয়ে গেছিল কী করে ছেলেটা কেউ জানে না, শুধু সে জানে কেউ কোনো কথা বলছে না সবাই চুপ। যেন কোনোদিন ওই ছেলেটা ছিলই না।

মনোজ কিছুই করেনি, তার খোঁজ বা কী ঘটেছিল জানতেও চায়নি। সে ভাবছিল নিজের কথা, একদিন তো সেও নিজের মতো গান, নেশা, প্রেমার সঙ্গে ঘোরাঘুরি। তারপর প্রেমার বোন হেমা-র তাকে প্রেম নিবেদন সেই নিয়ে ঝামেলা, সে কোনো কিছুই সামলাতে পারেনি। গানটানও তার হয়নি, সবার সব কিছু হয় না। মনোজ ভাবছিল, একবার অন্তত ফিরে গিয়ে দেখে, কথা বলে দেখে প্রেমের সঙ্গে, সব আগের মতো না হলেও একটা খোঁচা রয়ে গেছে সেটা অন্তত ঠিক করা যায় যদি।

মনোজ সে সুযোগ পাচ্ছে না দুদিন ধরে এই সোনাজ ট্যুর অ্যান্ড ট্রেক-এ বসে আরও গুলিয়ে গেছে তার সব কিছু। সে সময় নিয়ে আস্তে আস্তে খাবার শেষ করছিল। আজও কিছু বলতে পারবে না।

লোকটা ও মেয়েটার খাওয়া হয়ে গেছে, তার টাকা মিটিয়ে উঠল, লোকটা একটু কৌতুহলী চোখে দেখল মনোজের দিকে, এতক্ষণ বসে আছে কেন ছেলেটা এখানে, চুপচাপ, মালকিনের চেনা বোঝা যাচ্ছে কিন্তু চুপচাপ কেন। বোধহয় কিছু করে না, পাহাড়ের লোকগুলো একটু অদ্ভুত অলস ধরনের, এই সাধারণ ধারণাটাকে কারণ হিসেবে ভেবে নি।

গলায় মাফলারটা জড়িয়ে নাও, ঠান্ডা লেগে যাবে, মেয়েটাকে বেঞ্চ আর টেবিল-এর অপ্রশস্ত জায়গাটা দিয়ে বেরতে সাহায্য করতে করতে বলল লোকটা। মেয়েটা তার হাত ধরে বেরল, মাফলারটা ঠিক করল। তারপর লোকটা তার কোমরে হাত রাখল, মেয়েটা কিছু বলল না, দুজনে বাইরে বেরল।

হঠাৎ ফাঁকা দোকানটা বড় অস্বস্তিকর, মনোজ গলা খাঁকড়াল, প্রেমা হাসিমুখে তার সামনে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। কষ্ট হচ্ছিল প্রেমার, ছেলেটা কেন যে এখনো ঠিকঠাক মেনে নিতে পারল না অতীতকে। এখন কী আর এসব ভাবলে চলে, সময় খারাপ, বয়সও বাড়ছে। একটা বয়সের পর নিজেকে টিকিয়ে রাখার কাজটাই কঠিন মনে হয়, তখন আর অন্য কিছু নিয়ে ভাবা যায় কি? প্রেমা সেটা মেনে নিয়েছে, সেটায় খারাপ কিছুও মনে হয় না তার।

মেয়েটা আর লোকটা এখন নিঃশব্দে হোটেলে ফিরছে, তাদের ঝাপসা অবয়ব দেখা যাচ্ছিল, আঁকা বাঁকা রাস্তায় প্রায় নিঝুম দুপুরে তার দুজন নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, ট্যুরিস্টরা যেমন হয়, আশপাশের স্থানীয় লোকদের জীবন বা খবরে অনাগ্রহী।

মনোজ একবার তার দিকে তাকাল, প্রেম একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সে মাথা নাড়ল তারপর জানাল এমনিই এসেছে, দুপুরে কিছু করার থাকে না তাই।

এরপর সে আর কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়ল। কোনও লাভ নেই, তার আর কিছু ইচ্ছেও করছিল না, শুধু কাল থেকে আবার কাজে যেতে হবে যে করেই হোক, এটা ঠিক করে নিল।